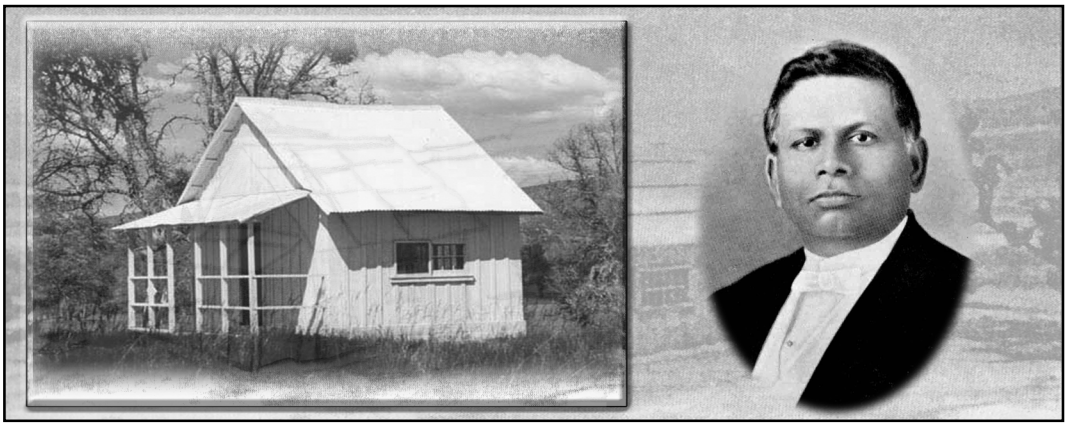

নির্ভীক কর্মী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ভ্রাতৃমণ্ডলীর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। কী সেবাব্রতে, কী আধ্যাত্মিকতা বিতরণে, আর কী তাঁর গুরুর ভাবপ্রচারে—সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক নিরলস কর্মী। আক্ষরিক অর্থেই তিনি এইসব কাজে প্রাণপাত করেছেন। ত্রয়োদশ সঙ্ঘাচার্য স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ সন্ন্যাসী-সন্তানদের অন্যতম বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে তিনি যেন স্বল্পজ্ঞাত। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের নানা উক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত, পরবর্তী প্রজন্মের সন্ন্যাসীরা তাঁদের স্মৃতিচারণ করেছেন, উক্তি সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু ত্রিগুণাতীতানন্দ সম্বন্ধে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। দুটি সম্ভাব্য কারণ, প্রথমত তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। গুরুভাই হলেও স্বামীজীর আদেশ ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছে গুরুর আদেশের মতোই শিরোধার্য ছিল। আদেশ পেলেই তা পালনে তিনি তৎপর হতেন—তা সম্ভব কি না বা কীভাবে তা সম্ভব সে-বিচারে না গিয়ে কাজে লেগে পড়তেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মাত্র পঞ্চাশ বছরের সীমিত আয়ুষ্কালের প্রথমার্ধ তিব্বত সহ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যটনে কেটেছে; শেষ বারো বছর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বেদান্তপ্রচার করে সেখানেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর জীবনে অবসরযাপনের সুযোগ হয়নি এবং দেশের কনিষ্ঠ সাধুরা তাঁর সঙ্গ করার সুযোগ পাননি। মার্কিন শিষ্য-শিষ্যাদের স্মৃতিচারণে দেখা যায় যে সেদেশে তিনি যা করেছিলেন তা পুরাণোক্ত মহাবীরের সমুদ্র-উল্লঙ্ঘন বা গন্ধমাদন উৎপাটনের সঙ্গেই তুলনীয়।

ছোটবেলা থেকে সারদা শান্ত, মেধাবী, পাঠানুরাগী ও ভক্তিমান প্রকৃতির ছিলেন। বাল্যাবস্থায় প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে ঠাকুরঘরে পূজার উপকরণগুলি গুছিয়ে রেখে পিতাকে পূজায় সাহায্য করতেন এবং তাঁর মুখে শুনে শুনে দেব-দেবীদের স্তবমালা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। পল্লির অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলাধূলার থেকে বাড়িতে বসে পড়তেই তিনি বেশি ভালবাসতেন। বাল্যবন্ধু নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, এক পুরনো

কাগজওয়ালার বস্তা ঘেঁটে তাঁরা দুই বন্ধুতে ছেঁড়াখোঁড়া বই খুঁজে বার করতেন এবং টিফিনের পয়সা দিয়ে সেগুলি কিনতেন। সেই বইগুলি তাঁদের কাছে মহামূল্যবান সম্পদ ছিল, যদিও তা পড়া বা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। সম্পন্ন মিত্রবাড়ির সন্তান সারদাপ্রসন্ন নিজগৃহে এইসব ছেঁড়া বইয়ের একটি লাইব্রেরি করে ফেলেছিলেন।

তাঁর চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিভূষিত করেছিল—ভক্তিভাব, সারল্য ও অমায়িকতার সঙ্গে ছিল এক অসাধারণ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা; কোনও বাধাই তাঁকে সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন নিরলস, পরিশ্রমী। কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান—এই প্রবন্ধ তারই একটি সারণি। শিশুসুলভ সারল্যের জন্য তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাইদের স্নেহের পাত্র ছিলেন।

ভারতের চিরাচরিত 'রম্‌তা সাধু'র জীবন মঠের সব সন্ন্যাসীদেরই আকর্ষণ করত—খোলা আকাশের নিচে ভূমিশয্যায় শয়ন, ভিক্ষালব্ধ খাদ্যে জীবনধারণ এবং পদব্রজে তীর্থভ্রমণ। শশী মহারাজ ছাড়া সকলেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তেন, ত্রিগুণাতীত ১৮৯১ নাগাদ প্রব্রজ্যায় বেরোন। পর্যটনকালে তিনি কবে কোথায় গিয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিছুকাল পরে 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় তিনি যে-তিব্বতভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি বিন্ধ্য, সাতপুরা, নীলগিরি এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, ত্রিপুরার গভীর অরণ্য এবং কামাখ্যাসহ ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চলে গিয়েছিলেন। পর্যটনকালে তিনি স্থানীয় আর্ত-পীড়িতের সেবা, শিশুশিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রচারের কাজও করতেন, যার জন্য স্বামীজী তাঁকে বাহবা জানিয়েছিলেন। ১৮৯১-এর শীতকালে আরাবল্লি অঞ্চলে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর তিব্বতভ্রমণের অভিজ্ঞতা, তিব্বতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা শুনে ত্রিগুণাতীতের তিব্বত-ভ্রমণের আগ্রহ জাগে। হিমালয়ের উচ্চতায় তীব্র শৈত্য এবং পথের দুর্গমতার সঙ্গে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেওয়ার জন্য তিনি তিন বছর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। ১৮৯৫-এর ৫ জুন তিব্বত-যাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১৪ জুন আলমোড়ায় পৌঁছন। সেখানে লালা বদ্রী শাহ এবং তাঁর সঙ্গীরা পথের দুর্গমতার ভয়াবহ বিবরণ দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তা নিষ্ফল বুঝে বদ্রী শাহ কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার জন্য সঙ্গী ও অর্থের ব্যবস্থা করলেন। পথের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর পরিচিতদের চিঠি লিখে সন্ন্যাসীর 'ভিক্ষা' ও 'আসনের' ব্যবস্থা রাখতে বললেন। সঙ্গী বা অর্থ কোনওটিই না নিয়ে ত্রিগুণাতীত ২১ জুন প্রাতে আলমোড়া ত্যাগ করে হিমালয় পার হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ত্রিগুণাতীত মহারাজের তিব্বতযাত্রার বিবরণের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর জীবনেতিহাসের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেভাবে তিনি আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে বর্ণনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন, তা তাঁর ইচ্ছাকৃত না হলেও বাস্তবানুগ হয়ে গেছে। এই তীর্থভ্রমণের প্রতি পদক্ষেপ যেন তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা—তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল, কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান এবং মৃত্যু যদি উদ্দেশ্যসাধনে পথরোধ করে দাঁড়ায় তবে তাকে সানন্দে বরণ। তাঁর অন্তরশক্তি পরাভব বলে কিছু জানত না। যাত্রাপথে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা বারবার তাঁকে বুঝিয়েছেন যে এই পথে মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু কোনও বিপদাশঙ্কাই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাঁর দুর্বল শরীর হিমালয়ভ্রমণের উপযুক্ত নয়, বারবারই মনে হয়েছে পথের বাধা হয়তো অলঙ্ঘ্য, কিন্তু ফিরে যাওয়ার চিন্তা তাঁর মনে একদণ্ডের জন্যও স্থান পায়নি। তাঁর মনে দৃঢ়বিশ্বাস

যে প্রভু সঙ্গে আছেন এবং নানা অলৌকিক দর্শনে সেই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হয়েছে তিব্বতের দ্বারপ্রান্তে এসে, পড়লে মনে হয় যে অভিযাত্রীর সেখানেই মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি—তিনি তিব্বতে পৌঁছেছেন, সেখানে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে এসেছেন।

এই দৃঢ়তা—পরিস্থিতির চাপে হার না মানার সংকল্প—এই তাঁর জীবনের ইতিহাস। তিব্বত-ভ্রমণের সঙ্গে তাঁর ভ্রমণস্পৃহা সাঙ্গ হয়, তিনি এবার কাজে ডুবে যেতে চাইলেন। ১৮৯৫ নাগাদ তিনি একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশনার কথা ভাবলেন, স্বামীজীও তাঁকে উৎসাহ দিলেন এবং মঠের সবাইকে এই কাজে সাহায্য করা বা সংগঠিতভাবে কাজে লাগার নির্দেশ দিলেন। মাত্র দুহাজার টাকা সম্বল—সে-পুঁজি কোনও কারণেই ভাঙা চলবে না—স্বামীজীর নির্দেশ। নেই অর্থবল বা লোকবল, আছে শুধু অদম্য উৎসাহ আর অপরিমেয় কর্মশক্তি, তাই দিয়ে শুরু হল ত্রিগুণাতীতের নতুন ব্রত—গুরুর ভাব প্রচারের জন্য পত্রিকা প্রকাশন। সঙ্গে সঙ্গে হয়নি সত্য, কিন্তু প্রায় অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করলেন সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায়। পদব্রজে মাইলের পর মাইল হেঁটে প্রবন্ধ জোগাড় করা, গ্রাহক সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অক্ষর সংস্থাপন, প্রুফ সংশোধন—কী নয়! নিজের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য অর্থ নেই, সময়ও নেই—ভক্ত-শিষ্যদের অনুগ্রহে যেদিন যেমন জোটে। আজ একশো সতেরো-তম বর্ষে বিশ্বের ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন' পত্রিকা স্বামী ত্রিগুণাতীতের তপঃসিদ্ধির জয়ধ্বজা উড্ডীন রেখেছে।

মার্কিন ভক্ত-শিষ্যদের সহায়তায় স্বামীজী সেদেশে দুটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন—নিউ ইয়র্ক ও সানফ্রান্সিসকোয়। এগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি গুরুভাই সারদানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দকে পাঠান। নিউ ইয়র্ক কেন্দ্রটি যথাযথভাবে এগিয়ে চললেও সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্র চলছিল হোঁচট খেতে খেতে। প্রথমত দূরত্বের জন্য এক কেন্দ্র থেকে দুটি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান সহজ ছিল না, তাই তিনি তুরীয়ানন্দজীকে দ্বিতীয় কেন্দ্রটির দায়িত্ব দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তুরীয়ানন্দজীর শরীর ওদেশের জলহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারল না। দুবছর পরেই তিনি ফিরে আসতে চাইলেন। স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। আবার বাধা এল—স্বামীজীর অকালপ্রয়াণে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠতে প্রায় একবছর লাগল। ১৯০৩-এর ২ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা ও জাপান হয়ে ত্রিগুণাতীত তাঁর নতুন তপঃক্ষেত্র সানফ্রান্সিসকোয় উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এক প্রত্যক্ষ শিষ্য আসছেন—এ-সংবাদে সেখানকার বেদান্ত-অনুরাগীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা দিল, ফলে সেখানে পদার্পণ করামাত্রই তাঁর অবসর বলে আর কিছু রইল না। নিজেও তিনি সময় নষ্ট করার পাত্র ছিলেন না, দীর্ঘ যাত্রার পর দুদিন মাত্র বিশ্রামের পরই তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু হল।

১৮৯৬-এর এপ্রিলে স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে লিখেছিলেন, ''আমি তোমাদের সুশৃঙ্খল, উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।'' স্বামীজীর এই ইচ্ছাকে মন্ত্ররূপে গ্রহণ করে নিজেকে সেইমতো তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন, তাঁর কাজের ধারাও ছিল পরিকল্পনামাফিক। যে-কাজের দায়িত্ব তিনি নিতেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থাপনা করতেন। সুশৃঙ্খল উপযুক্ত কর্মীর স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন 'উদ্বোধন' প্রকাশনায়, দিনাজপুরে বন্যাত্রাণে। দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর সুশৃঙ্খল নিখুঁত কাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সমিতির দায়িত্ব লাভ করে তার জন্য সুর্নিদিষ্ট নিয়মাবলি প্রণয়ন করে তিনি

সংগঠিত করার পথ নিলেন। ২২ জানুয়ারি সমিতির অধিবেশনে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে এই সমিতি কোনও সামাজিক সভা বা সংগঠন নয়, একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে দর্শনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শেখানো হয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ সামনে রেখে কাজ করতে শেখানো হয়। যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের মতো এখানেও কয়েকটি নিয়ম বলবৎ থাকবে যা সকলকে মেনে চলতে হবে। স্বামী তুরীয়ানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নিয়মের কঠোরতার প্রতিবাদ জানালেন, ত্রিগুণাতীতানন্দজী প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন।

ভগিনী গার্গীর মতে পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারের কঠিন কাজটির জন্য স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে মনোনীত করেছিলেন, তাঁর মনোনয়ন ভুল হয়নি। ত্রিগুণাতীতের জীবনে বোধ হয় তা ছিল কঠিনতম কর্তব্য। পাশ্চাত্যমানসে প্রাচ্যের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু অসংলগ্ন ও উদ্ভট ধারণা ছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বামী ত্রিগুণাতীত এলেন। সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর চালিকাশক্তি ছিল গুরুপ্রতিম গুরুভ্রাতার নির্দেশ এবং কর্তব্য ছিল তাঁরই আরব্ধ কাজকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্য ভেদ করতেই তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তাঁর পথরোধ করেছে।

প্রথমেই তিনি মিসেস কারা ফ্রেঞ্চের কাছে সমিতির সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এ-যাবৎ সমিতির সভাপতি ছিলেন ড. লোগান, সমিতির নামে প্রকাশিত তাঁর একটি পত্রিকা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, স্বামী তুরীয়ানন্দ সহ সমিতির অধিকাংশ সভ্য সেটি প্রচারের বিপক্ষে ছিলেন, কারণ পরবর্তী কালে আইডা আনসেল জানিয়েছেন যে এতে বিস্তর ভুল তথ্য থাকত। তাছাড়া সেটির জন্য সমিতির বেশ মোটা অঙ্কের ঋণ হয়েছিল। কালবিলম্ব না করে সমিতির প্রথম নিয়মিত অধিবেশনেই ত্রিগুণাতীতানন্দজী ওই প্রসঙ্গ তুললেন এবং ভোটে হেরে গিয়ে লোগান পদত্যাগ করলেন। তবে সেখানেই শেষ নয়, সমিতিকে উদ্দেশ করে লেখা চিঠিতে বিষ উগরে দিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ত্রিগুণাতীতানন্দের উপর। তুরীয়ানন্দের ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা শুরু করলেন। গুরুদাস মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী অতুলানন্দ) 'শান্তি আশ্রমে'র একক দায়িত্বে ছিলেন, তিনিও সেখান থেকে চলে এলেন। অনুগামী ভক্তদের নিয়ে শুরু হল স্বামী ত্রিগুণাতীতের কঙ্করাকীর্ণ পথ পরিক্রমণ।

প্রথম ছমাসে ত্রিগুণাতীতের কাজের একটি খতিয়ান পাওয়া যায়—সানফ্রান্সিসকোয় ছাব্বিশটি রবিবাসরীয় বক্তৃতা; লস এঞ্জেলেসে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সমিতির সভ্যদের নিয়ে যথাক্রমে গীতা ও উপনিষদ অনুশীলন—তেরোটি ক্লাস। ইতিমধ্যে সমিতির কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় পিটারসেন পরিবারের গৃহে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না, তাই শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সমিতির কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। মহারাজের স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল, বিশ্লেষণধর্মী বক্তৃতার জনপ্রিয়তা বাড়ছিল, তাই রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলিও ওই বাড়িতেই হচ্ছিল। লস এঞ্জেলেস থেকেও তাঁর ডাক আসছিল। চারশো পঁচিশ মাইল দূরবর্তী ওই শহরেও মহারাজ বেদান্ত অনুশীলনের সূচনা করলেন বটে, কিন্তু দূরত্বের কারণে একই সঙ্গে দুজায়গায় কাজের অসুবিধার দরুন তিনি দেশ থেকে অন্য এক সন্ন্যাসীকে পাঠাতে বললেন।

১৯০৪-এর মধ্যে কাজকর্ম এত বেড়ে গিয়েছিল যে সকলেই সমিতির একটি নিজস্ব ভবনের কথা ভাবছিলেন, সেই অনুসারে জমি কিনে ১৯০৫ সালের ২৫ আগস্ট স্বামী ত্রিগুণাতীত পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। মন্দির, গির্জা, মসজিদ ও মার্কিন

বাসগৃহের সমন্বয়ে মন্দিরটি তৈরি হল। ১৯০৬ সালের ১৫ জানুয়ারি সেটি মানবাত্মার কল্যাণে উৎসর্গ করা হয়। মন্দির নির্মাণেও তাঁকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মেরি ম্যাগি নামে এক মহিলা, সমিতির আর এক সদস্যাকে জানিয়েছিলেন যে মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি একটি কপর্দকও সাহায্য করেননি।

সানফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সান আন্তোন উপত্যকায় মিনি বুক নামে স্বামীজীর ভক্ত এক মহিলা একশো ষাট একর জমি দান করেন। স্বামীজীর ইচ্ছাক্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ সেখানে নির্জনবাসের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, নাম দেন শান্তি আশ্রম। স্বামী ত্রিগুণাতীত আশ্রমবাসীদের জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেন। নিরামিষ ভোজন, স্ত্রী-পুরুষ আলাদা বসার ব্যবস্থা (খাবার টেবিলেও) মার্কিনিদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও সকলে তা মেনে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী কালে স্মৃতিচারণে তাঁরা নিয়মের কঠোরতার কথা ভুলে আনন্দের স্মৃতিই রোমন্থন করেছেন।

লস এঞ্জেলেস এবং নিকটবর্তী ওরেগন অঞ্চলেও মহারাজের কাজকর্ম অব্যাহত ছিল। সুসংবদ্ধ নিয়মাবলি প্রবর্তন করে তিনি সেখানেও একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। সানফ্রান্সিসকো থেকে দেড়ঘণ্টার দূরত্বে কংকর্ড নামক অঞ্চলে দুশো একর জমি কিনে মহারাজ সেখানে একটি উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন, যেখানে সমিতির সদস্যরা অবসরজীবন যাপন করবেন। এমনভাবে জমি বিলি করা হয়েছিল যে সেখান থেকে সমিতির একটি নির্দিষ্ট আয় হত। সেখানে অনাথ আশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতির পরিকল্পনা ছিল এবং সানফ্রান্সিসকোর অবিরাম কার্যসূচির মধ্যেও মহারাজ কলোনিতে বেদান্তশিক্ষা দিতে যেতেন।

নবগঠিত মন্দিরে তিনি একটি সন্ন্যাসিসঙ্ঘ এবং শহরের এক বাড়িতে একটি সন্ন্যাসিনীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। নানারকম পরিবর্তন ও কঠোর নিয়মাবলি প্রথমদিকে অনেককে বিভ্রান্ত করলেও শেষ পর্যন্ত সকলে উপকৃতই হয়েছিলেন। ওখানে যাওয়ার আট বছর পর, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি ওই অঞ্চলের তৎকালীন এবং ভবিষ্যৎ বেদান্ত সমিতিগুলি পরিচালনার যে-বিধান রচনা করেছিলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তাঁর এক শিষ্য কার্ল পিটারসেন বলেছেন, ''অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অফুরন্ত উৎসাহ—কেউ তা বিনষ্ট করতে পারত না—তাই দিয়ে গঠিত ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের ব্যক্তিত্ব।'' অন্যতম শিষ্যা কারা ফ্রেঞ্চের উক্তি : ''স্বামীজী শিখিয়েছেন দর্শন, তুরীয়ানন্দ দেখিয়েছেন আদর্শ সন্ন্যাসজীবন এবং ত্রিগুণাতীত দেখালেন নিষ্কাম কর্মযোগ।''

সহায়ক গ্রন্থ

১। Sister Gargi (Marie Louise Burke), A Heart Poured Out (Kalpa Tree Press, New York, 2003)

২। Swami Atulananda, *With the Swamis of America and India* (Advaita Ashrama, Mayavati, 1988)

৩। Earnest C. Brown, *The Work of Swami Trigunatitananda in the West*, Prabuddha Bharata (Advaita Ashrama, Mayavati, 1928)

৪। Sister Gargi (Marie Louise Burke), *Swami Trigunatita, His Life and Work* (Advaita Ashrama, Kolkata 1997)